

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : রিকশাচালক,

শাহাদাতের স্থান : শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল।

শহীদের জীবনী

বাংলাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তথা জুলাই বিপ্লবে সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা পৃথিবীর প্রান্তিক জনতার অন্যতম প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলমের নির্মম মৃত্যুই প্রমাণ করে এদেশের স্বৈরশাসক আওয়ামী সরকার কিভাবে গণহত্যা সম্পাদন করেছে।

শহীদ জাহাঙ্গীর আলম ১৯৯০ সালের ১ জানুয়ারি নরসিংদী জেলার মাধবদী থানার আটপাইকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মজিদ মিয়া এবং মায়ের নাম আফিয়া। তিন ভাই-বোনের মধ্যে সবার বড় জাহাঙ্গীর। তিনি পেশায় একজন রিকশাচালক ছিলেন। অন্যের রিকশা ভাড়া চালাতেন। ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তথা জুলাই বিপ্লবে সরকার পতনের একদফা দাবিতে আন্দোলনে গিয়ে তিনি শহীদ হন।

তৃণমূল নাগরিক জাহাঙ্গীর আলম

দেশের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর একজন অন্যতম প্রতিনিধি হচ্ছেন শহীদ জাহাঙ্গীর আলম। মহাজনের রিকশা ভাড়া নিয়ে সারাদিন যাত্রী টেনে যা পান তাই দিয়ে দরিদ্র পরিবারের ভরণপোষণের চেষ্টা চালান তিনি। রিকশা চালিয়ে কোনদিন ভালো খ্যাপ হয়, আবার কোনদিন হয়না। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতির বাজারে গিয়ে পরিবারের জন্য চাল, ডাল, নুন কিনেই ফুরিয়ে যায় তাঁর সারা দিনের উপার্জন। পরিবার পরিজনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য গায়ের রক্ত পানি করে পরিশ্রম করতে হয় তাঁকে। একটু ভালো খাওয়া, ভালো কাপড় পড়া, ভালো জায়গায় থাকার স্বপ্নই যেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন। এই এতটুকু স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য জীবনের সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যেতে হয়। রিকশা চালক জাহাঙ্গীর আলমের মত সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষ যেখানে এক বেলার মাছ কিনতেও ১০ দোকান ঘুরে দেখেন; বারবার দামাদামি করেন দোকানিদের সাথে; আর বেশিরভাগ সময় দামে না মিলার কারণে বাজারেই রেখে যেতে হয় পছন্দের একভাগা গুরামাছ, সেখানে ভালো খাবার, ভালো পোশাক, ভালো বাসস্থান আর ভালো কোন স্কুলে সন্তানদের লেখাপড়া করানোর স্বপ্ন বড়ো বেমানান বটে। কিন্তু তাঁরা যখন একজন স্বামী; একজন পিতা; একজন বড় ভাই বা পরিবারের অন্যতম একজন অভিভাবক, তখন তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব কি তাঁরা অবহেলা করতে পারেন?

না, পারেননা। পারেননা বলেই একমাত্র সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা করে নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে পরিবারের জন্য, স্বপ্ন পূরণের জন্য অনবরত সংগ্রাম করে যান তাঁরা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন সারাটা জীবন। এই জীবনযুদ্ধে তাঁরা কখনো আহত বা অসুস্থ হন। কিন্তু কখনোই তাঁরা হেরে যাননা। হেরে যাননি শহীদ জাহাঙ্গীর আলম নিজেও। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন পরিবারের জন্য; দেশের জন্য; দেশের মানুষের জন্য; গণমানুষের ন্যায্য অধিকারের জন্য; সমাজ, রাষ্ট্র আর জাতির সমস্ত বৈষম্য দূরীকরণের জন্য।

রিকশাচালক যে কারণে আন্দোলনে আসলেন

গ্রামের সহজ সরল একজন রিকশাচালক জনাব জাহাঙ্গীর আলম। পেটের ক্ষুধা, মনের ব্যথা ঢেকে রাখা সদা হাস্যোজ্জ্বল বোকা-সোকা এই ব্যক্তিকে সবাই ভালবাসতো কেবলমাত্র তার সরলতা আর সততার জন্য। এমনকি এলাকার ছোট বড় অনেকেই শহীদ জাহাঙ্গীর আলমের সাথে দুষ্টিম করতো। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কথায় তাঁকে খোঁচাতো, মজা করতো। উদার মনা জাহাঙ্গীরও প্রাণ ঢেলে তাদের ভালোবাসা দিতেন। জীবনের না পাওয়া দুঃখটুকু ভোলার চেষ্টা করতেন। অন্যদের দুঃখও ভুলিয়ে দিতে চাইতেন। তাই কখনো কারো সাথে রাগ করতেন না। আর রাগ কেন করবেন? তিনি তো একজন রিকশাওয়ালা। আপামর জনতার নিত্যদিনের সুখ-দুঃখের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষী। রাস্তা-ঘাটে, হাট-বাজারে, অলি-গলিতে এক কথায় ঘরে-বাইরে বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার সাক্ষী। তাই তিনিই তো ভালো বুঝেন আমজনতার পালস; তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা। ২০২৪ সালের জুলাই মাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে, রাজপথে বিভিন্ন রকম শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ, মিছিল মিটিং, শোভাযাত্রা করে যাচ্ছে। ১৬ জুলাই স্বৈরাচার সরকার শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে চালায় গুলি। রংপুরের রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদসহ সারাদেশে অন্তত ৬ জন শিক্ষার্থী শহীদ হয়। আহত হয় শত শত শিক্ষার্থী। বাস! মৌচাকে ঢিল মারার মত বোকামি করল মাথামোটা আওয়ামী সরকার। একবার দুইবার নয়, বারবার বহুবার। গুলি খেয়ে ফুঁসে উঠে সারা দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও যোগ দেয় তাদের সাথে। দাবি আদায় না করে তারা ঘরে ফিরবে না। চার বছর আগে ২০১৮ সালে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে স্কুল কলেজের ছোট ছোট বাচ্চারা তখন ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করেছিল সুশৃংখলভাবে। তারা গাড়ির কাগজ, ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকায় আটকিয়ে দিয়েছিল পুলিশ আর র্যাবের গাড়িও। এক প্রকার নাকানিচুবানি খাইয়ে ছেড়েছিল স্বৈরাচারী হাসিনার প্রশাসনকে। সেই চার বছর পর আজ আরো পরিপক্ব হয়েছে তারা। সিনিয়রদের সাথে মিলে গড়ে তুলেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের আন্দোলন যেমন কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে উঠছে খুনি হাসিনার পুলিশ, র্যাব, বিজিবি, সোয়াট, আনসারবাহিনী তেমনি শিক্ষার্থীদের রক্তে হলি খেলায় মেতে উঠেছে। ১৬ জুলাইয়ের পর প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের রক্তে রঞ্জিত হয় রাজপথ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের হল, হোস্টেল, বাসা-বাড়ি সবকিছু। ১৮ জুলাই শিক্ষার্থীদের উপর ম্যাসাকার করে কারফু জারি করে আর ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয় খুনি হাসিনা। তারপর জায়গায় জায়গায় চালায় গোপন গণহত্যা, গণকবর আর রাতের আধারে ২৫ মার্চের কাল রাতের মত গণ গ্রেপ্তার। একদিকে কারফিউর কারণে সাধারণ মানুষ ঘরবন্দি অন্যদিকে ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় সামাজিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন জনতা স্বৈরাচার সরকারের গোপন অপকর্মের কোন কিছুই জানতে পারলনা। এক সময় কারফিউ তুলে নিলে ব্যাপকভাবে শিক্ষার্থীরা আবারও রাজপথে নামে। আবারও শুরু হয় খুনি হাসিনার ম্যাসাকার। বিশ্ব বেইমান হাসিনার ইশারায় চলে আদালতে দাবি মেনে নেওয়ার নাটক।

অবশেষে জনতার ক্ষুব্ধ রোষে এবং আন্তর্জাতিক চাপে ইন্টারনেট চালু করে দেয় আওয়ামী সরকার। অতঃপর বাংলাদেশের মানুষের সাথে সারা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করে যে, কারফিউ দিয়ে আর ইন্টারনেট বন্ধ করে কিভাবে শিক্ষার্থীদের গণহত্যা করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেসব ছবি আর ভিডিও পৌঁছে যায় মানুষের হাতে হাতে। সাধারণ জনতা আর ঘরে বসে থাকতে পারেনি। জনশ্রোত হয়ে নেমে আসে রাস্তায়। এবার শিক্ষার্থীদের সাথে যোগ দেন শিক্ষক-শিক্ষিকা, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, আইনজীবী, মুটে-মজুর, শ্রমজীবীসহ বাংলার আপামর জনতা। শুরু হয় সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন। স্বৈরাচার খুনি হাসিনা রাষ্ট্রযন্ত্রের এমন কোন অস্ত্র বাকি রাখেনি যা আন্দোলনকারীদের উপর প্রয়োগ করেনি। কেবলমাত্র স্বৈরাচারীর সীল মারা তাদের নিজস্ব কিছু পাপাচারীদের বাদে যেখানে যাকে যে অবস্থায় পেয়েছে তাকে সেই অবস্থায় গুলি করে, পিটিয়ে, কুপিয়ে খুন করেছে রক্তপিপাসু হাসিনার প্রশাসন এবং তাদের চরিত্রহীন লম্পট গুণ্ডা পেটোয়া ছাত্রলীগ, যুবলীগ আর আওয়ামী লীগ। শাহবাগী নাস্তিক আর ওলামালীগদেরও নামিয়েছে ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে। হেলিকপ্টার দিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি করে মেরেছে সাধারণ মানুষ। রক্ষা পায়নি ঘরের ভিতরে খেলতে থাকা ছোট ছোট শিশু বাচ্চারাও। খুনি হাসিনার গুলি খেয়ে নিজের পুতুলের সামনে লুটিয়ে পড়েছে নাবালক শিশুরা। দেশের এমন দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে নড়ে ওঠে দেশের অতি সাধারণ নাগরিক রিকশাচালক জাহাঙ্গীর আলমের হৃদয়। শত সহস্র প্রশ্ন জাগে তাঁর মনে।

এই লাশের নগরী; এই মৃত্যু বিভীষিকাময় দেশ; এই আত্মহীন অবিশ্বাসের রাষ্ট্র; এই রক্ষকরূপী ভক্ষকদের উল্লাসমঞ্চ; রক্তে রঞ্জিত রাজপথ; মজলুমের আহাজারিতে পরিপূর্ণ আকাশ; হতাশা, অভিশাপ মিশ্রিত বাতাস; এই গজবের মহাদেশ কি তাঁর প্রিয় জন্মভূমি? তার বাংলাদেশ? প্রতিনিয়ত এমন রাক্ষসের কামড় খাওয়া আর কত? রক্ত পানি করা উপার্জনের ভাগ ঘুষখোর হারামখোর ট্রাফিক পুলিশকে দিতে হবে আর কতকাল? রাস্তা ঘাটে অলিতে-গলিতে সারাদিনের কামাই ছাত্রলীগ যুবলীগ ছিনতাইকারীদের, চাঁদাবাজিদের হাতে তুলে দিতে হবে আর কত?

বৃদ্ধ বাবা-মা টাকার অভাবে চিকিৎসাহীনতায় ভুগবে আর কত দিন? স্ত্রীর শরীরে জরাজীর্ণ পোশাক আর কত দিন? সন্তানের সামনে শূন্য ভাতের থালা আর কত? ভাই-বোনদের সামনে ব্যর্থতার লজ্জিত মুখ আর কত দিন? বেঁচে থাকার মৌলিক চাহিদা পূরনের এই সংগ্রাম আর কতদিন? আর কতকাল?

সরল সহজ জাহাঙ্গীর আলমের মনে প্রশ্ন জাগে। কিন্তু উত্তর কোথায়?

উত্তর আসে রাজপথ থেকে। উত্তর আসে ছাত্র-জনতার আন্দোলন থেকে। উত্তর আসে একের পর এক মৃত্যু থেকে। উত্তর আসে শহীদি মিছিল থেকে। উত্তর আসে দেশব্যাপী বৈষম্যের অরাজকতা থেকে।

একদিকে ঘরে খাবার নেই। অপরদিকে রাস্তায় বের হওয়া যাবে না। বের হলেই গুলি! পাখির মতো গুলি করে ওরা মানুষ মারে। সাপের মতো পিটিয়ে পিটিয়ে ওরা মানুষ মারে। কসাইয়ের মত কুপিয়ে কুপিয়ে ওরা মানুষ মারে।

হয় ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে না খেয়ে মরতে হবে, না হয় রাস্তায় গিয়ে গুলি খেয়ে মরতে হবে।

বেঁচে থাকার আর কোন উপায়-ই যেন ওরা খোলা রাখলো না সাধারণ মানুষের জন্য।

এই যখন দেশের অবস্থা; এটাই যখন নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষের বাস্তবতা তখন জাহাঙ্গীর আলমের মত এক সাধারণ রিকশাওয়ালার জেগে ওঠাও অবাস্তব নয়; অবাস্তব, অকল্পনীয়, অযৌক্তিক নয়। এটা সময়ের অপরিহার্য দাবি; যৌক্তিক বাস্তবতা। অতঃপর শহীদ জাহাঙ্গীর আলম সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তিনি যোগ দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তথা জুলাই বিপ্লবে সরকার পতনের এক দফা দাবি আদায়ে।

যেভাবে আহত হলেন

২০২৪ সালের ৪ আগস্ট দুপুর ১১ টায় শহীদ জাহাঙ্গীর আলম রিকশা চালাতে যাওয়ার কথা বলে জন্মদাত্রী মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যান।

রিকশা চালাতে না গিয়ে তাঁর পরিচিতজনদের সাথে যোগ দেন সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনে। পৌরসভার সামনে স্বৈরাচার সরকারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করছিলেন তাঁরা। মানুষ মারতে মারতে যেন প্রশাসনের খুনি বাহিনীরাও ক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তাই যেন সেদিন পৌরসভার সামনে নিরীহ নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর প্রশাসনের কোন বাহিনীর আগ্রাসন লক্ষ্য করা যায়নি। শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের দাবির পক্ষে স্লোগান দিচ্ছিল আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা। দুপুর ১২ টার দিকে হঠাৎ খুনি হাসিনার লেলিয়ে দেওয়া কুকুর আওয়ামী সন্ত্রাসীরা এসে এলোপাতাড়ি গুলি করে আন্দোলনরতদের উপর। এমন অতর্কিত হামলায় ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় ছাত্র-জনতা। গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কয়েকজন। সবাই ছুটাছুটি করে নিরাপদ অবস্থানের জন্য। এমন সময় খুনিদের একটা বুলেট পিছন দিক থেকে এসে ঢুকে যায় জাহাঙ্গীর আলমের মাথায়। সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। আওয়ামী গুন্ডারা অস্ত্রবাজি শেষে পালিয়ে গেলে ছাত্র-জনতা আবার ছুটে আসে আহত, নিহতদের উদ্ধার করতে। সবাইকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাসপাতালে।

যেভাবে শহীদ হলেন

গুলিবিদ্ধ জাহাঙ্গীর পড়েছিলেন রাস্তার একপাশে। কেউ তাকে খেয়ালই করেনি। কিছুক্ষণ পরেই একজনের নজর আটকে যায় পড়ে থাকা গুলিবিদ্ধ জাহাঙ্গীরের উপর। সাথে সাথে তাঁকেও তুলে নিয়ে যায় আন্দোলনকারীরা। পৌরসভার পাশেই দেওয়ান হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় মাথায় গুলিবিদ্ধ জাহাঙ্গীর আলমকে। পরিচিত একজন দেখে তার পরিবারকে খবর দেন। খবর পেয়ে জাহাঙ্গীর আলমের ছোট ভাই মোঃ সাইদুল ছুটে আসেন হাসপাতালে। দেওয়ান হাসপাতালে জাহাঙ্গীর আলমকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পরে ডাক্তারের পরামর্শে তাকে কুর্মিটোলা হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁর ভাই ও ছাত্র-জনতা। সেখান থেকে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে। এখানে রক্ত পিপাসু হাসিনার ধারালো দাঁতের বিষের সাথে লড়াই করতে করতে রাত ৯ টায় নির্মম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন শহীদ জাহাঙ্গীর আলম। মজলুম শহীদদের গণনা খাতায় যোগ হয় আরও একটি সংখ্যা। তাগ আর কোরবানির ইতিহাসে রক্তক্ষরে লেখা হয় আরো একটি নাম - জুলাই বিপ্লবের বীর; বিশ্ববাসীর কাছে আওয়ামী স্বৈরাচারের গণহত্যার প্রমাণ রিকশাচালক শহীদ জাহাঙ্গীর আলম।

শহীদের লাশ উদ্ধার

শহীদ জাহাঙ্গীর আলম ৪ আগস্ট সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেও তাঁর লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করতে শুরু হয় নানা টালবাহানা। পোস্টমর্টেম ছাড়া লাশ দেওয়া যাবে না; আজকে রাতে পোস্টমর্টেম করা যাবে না; পুলিশ ক্লিয়ারেন্স লাগবে; পরেরদিন পোস্টমর্টেম করতে বহু লাশের সিরিয়াল; পোস্টমর্টেম করতে চিকিৎসকদের বীরগতি; দেশের সার্বিক খারাপ পরিস্থিতি; এরকম নানা অজুহাত তুলে ধরে হাসপাতাল থেকে। অবশেষে ৫ আগস্ট খুনি হাসিনা লক্ষণ সেনের মত থিডকী দিয়ে পালানোর পরে ছাত্র-জনতা আর হাজার হাজার অভিভাবকদের তোপের মুখে লাশ দিতে বাধ্য হয় হাসপাতাল। ৫ আগস্ট পোস্টমর্টেম শেষে বিকাল ৩ টায় জাহাঙ্গীর আলম এর মরদেহ নিয়ে বাড়ির পথে রওনা দেয় এম্বুলেন্স।

শহীদের দাফন কাফন

বিকাল ৩ টায় জাহাঙ্গীর আলমকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে রওনা দিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তার বাড়িতে পৌঁছে যায় এম্বুলেন্স। গাড়ি থেকে লাশ নামানোর সাথে সাথেই শোকে বিহ্বলে আকাশ বাতাস ভারী করে তোলে উপস্থিত জনতা।

তাঁর বাবা-মায়ের আর্তনাদ দেখে সহ্য করার ক্ষমতা ছিল না কারো। ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তান আর পাড়া-প্রতিবেশীদের কান্নায় অশ্রু ঝরতে বাধ্য হয় উপস্থিত

প্রতিটি নয়ন। অবশেষে নিজের গ্রামের ঈদগা মাঠে হাজারো জনতার উপস্থিতিতে জানাজা শেষে ওই ঈদগাহ কবরস্থানে দাফন করা হয় শহীদ জাহাঙ্গীর আলমকে। পৃথিবীর প্রান্তিক জনতার অন্যতম প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলম কবরের মধ্যে নিজের আবাস করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দিয়ে গেলেন সুন্দর একটা বসুন্ধরা; দিয়ে গেলেন মুক্তি; রেখে গেলেন বিপ্লবের ধারাবাহিকতা।

পরিচিতজনের মন্তব্য

শহীদ জাহাঙ্গীর আলম সম্পর্কে তাঁর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন আর পাড়াপ্রতিবেশিদের কাছে জানা যায়, তিনি ছিলেন একজন অতি সহজ সরল মানুষ। কখনো কারো সাথে ঝগড়া বিবাদ করতেন না। ছোট বড়ো অনেকই তাঁর সাথে হাসিঠাট্টা করলেও তিনি কখনো রাগ করতেন না। সদা হাস্যজ্বল জাহাঙ্গীর আলম সবার সাথেই মিশতে পারতেন। তাঁর কোন মান অভিমান ছিলো না। একেবারে মাটির মানুষ ছিলেন তিনি।

শহীদের পারিবারিক অবস্থা

শহীদ জাহাঙ্গীর আলম মৃত্যুর আগে তাঁর পরিবারের ছয়জন সদস্যকে রেখে গেছেন। তাঁর বাবা মজিদ মিয়া (৫৫) একজন প্রান্তিক কৃষক। মা আফিয়া (৪৫) একজন গৃহিণী। একমাত্র বোন মানসুরা (২৭) স্বামী পরিত্যক্ত গৃহিণী। এখন সে বাবার বাড়িতেই থাকেন। একমাত্র ভাই মোহাম্মদ সাইদুল (২৫) ব্যাটারি তৈরির কারাখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। স্ত্রী (২৬) একজন গৃহিণী। একমাত্র কন্যা মোছাম্মৎ মোহনা (৬) উইসডম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্লে-তে পড়ে। শহীদের বাবা মজিদ মিয়ার ঘর টিনের তৈরি। নিজেদের জায়গায় মাত্র ২% জমি আছে। ভরণপোষণ চলছে ছোট ভাইয়ের সীমিত উপার্জনে। পরিবারের অন্য কোন সদস্যরা উপার্জন সংক্রান্ত কোনো কাজের সাথে জড়িত নন।

প্রস্তাবনা

এমতাবস্থায় শহীদ জাহাঙ্গীর আলমের রেখে যাওয়া পরিবারের পাশে দাঁড়ানো সরকারের পাশাপাশি আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

শহীদের স্ত্রী-সন্তান ও মা-বাবার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা;

একমাত্র মেয়ের লেখাপড়ার খরচ চালানো;

ছোট ভাইকে কোন ব্যবসার ব্যবস্থা করে দেয়া;

শহীদের বিধবা স্ত্রী আর স্বামী পরিত্যক্ত বোনের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা এবং তারা সম্মতি দিলে উপযুক্ত জায়গায় পাত্রস্থ করা এই পরিবারের জন্য সময়ের দাবি বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

এক নজরে শহীদ জাহাঙ্গীর আলম

পূর্ণ নাম : জাহাঙ্গীর আলম

জন্ম : ১ জানুয়ারি ১৯৯০

মৃত্যু : ৪ আগস্ট ২০২৪

জন্মস্থান : আটপাইকা, নরসিংদী

পিতার নাম : মজিদ মিয়া

মাতার নাম : আফিয়া

বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম - আটপাইকা, ওয়ার্ড নং ৭, থানা - মাধবদী, জেলা- নরসিংদী

পেশাগত পরিচয় : রিকশাচালক

পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ০৬

আন্দোলনে যোগদান : ৪ আগস্ট ২০২৪, মাধবদী পৌরসভার সামনে

আহত হওয়ার সময় : ৪ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১২ টা, পৌরসভার সামনে

আঘাতকারী : আওয়ামীলীগ সন্ত্রাস

শহীদ হওয়ার দিন সময় ও স্থান : ৫ আগস্ট ২০২৪, রাত ৯ টায়, শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল

জানাযার সময় ও স্থান : ৫ আগস্ট ২০২৪, বাদ আসর, গ্রামের ঈদগাহ মাঠ

শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান : নিজের গ্রামের কবরস্থান